বাকস্বাধীনতা খর্ব হলে সুবিধে রাষ্ট্রেরই

বহুকাল আগে বাম রাজনৈতিক মহলে একটা কথা শোনা যেত, ‘ভুখা মানুষ, ধরো বই, ওটা হাতিয়ার’। কিন্তুবাদীদের অনুরোধ, বাকস্বাধীনতার অধিকার খর্ব হলে আখেরে ভুখা মানুষের হাতে হাতিয়ার কমবে না বাড়বে ভেবে দেখতে।

মৈত্রীশ ঘটক ও অমিতাভ গুপ্ত

২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

আনন্দবাজার পত্রিকা

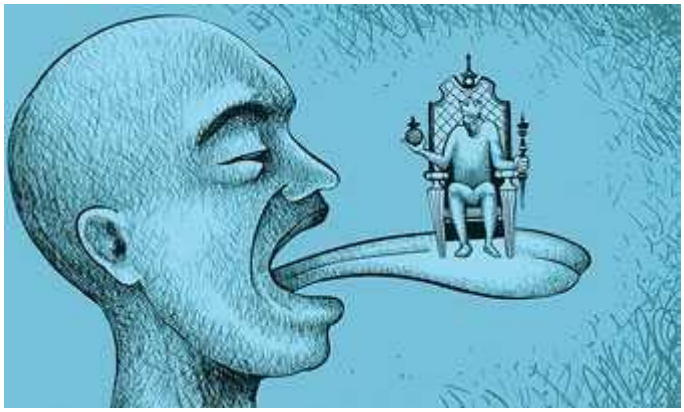

শার্লি এবদোর ঘটনার পরে বামপন্থীদের (কথাটা পার্টিগত ভাবে নয়, মতাদর্শগত ভাবে ব্যবহার করছি) একটা অংশের প্রতিক্রিয়া শুনে সলমন রুশদি তাঁদের নাম দিয়েছেন ‘দ্য বাট (but) ব্রিগেড’। বাংলায় বলতে পারি ‘কিন্তুবাদী’। মোক্ষম নামকরণ। শার্লি এবদোর ঘটনা আমাদের স্মৃতিতে হয়তো খানিক ফিকে হয়ে এসেছে। কিন্তু সব সময়েই এই ধরনের ঘটনায়, যেখানে ক্ষমতাহীন বা নিপীড়িত কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এমন কাজ বা দাবি করছে যা আপাতদৃষ্টিতে অন্যায় মনে হবে, এক ধরনের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে অনেকগুলো ‘কিন্তু’ থাকে। যেমন, এ ভাবে মানুষ মারা একেবারেই সমর্থনযোগ্য নয়, ‘কিন্তু’ বাকস্বাধীনতার দোহাই দিয়ে যা খুশি তা-ই বলা বা ছাপাও তো যায় না, বিশেষত তার আক্রমণ বা শ্লেষের লক্ষ্য যদি হয় সামাজিক বা অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বলতর গোষ্ঠী। মহম্মদের কার্টুন আঁকলে মুসলমানদের মনে আঘাত লাগবে, এই কথাটা যখন জানাই ছিল, তখন কী দরকার সে কাজ করার?

আপত্তিগুলো উড়িয়ে দেওয়ার নয় একেবারেই। কিন্তু বামপন্থীরা যেহেতু নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ক্ষমতাহীন এবং নিপীড়িত শ্রেণির প্রতি সহানুভূতিশীল, প্রশ্ন উঠতে পারে, তাঁদের এই প্রতিক্রিয়া কি তাঁদের মূল অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? না কি, এই ধরনের যুক্তি এমন কোনও পিছল ঢালু রাস্তায় নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রাখে, যাতে আখেরে ক্ষমতাহীন এবং নিপীড়িত শ্রেণির মানুষরাই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন?

কিছু মানুষ নিশ্চয়ই বলবেন, কোন কথায় কার মনে আঘাত লাগল সেটা বিবেচ্যই নয়। বাকস্বাধীনতা শুধু স্বাধীনতাটুকুর কারণেই জরুরি। যে কোনও বিশ্বাসভিত্তিক অবস্থানের মতো, এই অবস্থানটির সঙ্গেও তর্ক চলে না। কিন্তু এ রকম বিশ্বাসভিত্তিক অবস্থানের বদলে আর পাঁচটা বিষয়ের মতো এখানেও আমরা ফলাফলের দিক থেকে তার বিচার করতে পারি। অর্থাৎ, সবার অবাধ বাকস্বাধীনতা স্বীকার করে নিলে তার ফল কী, আর রাষ্ট্রকে সেই স্বাধীনতা খর্ব করতে দিলে তার ফলই বা কী? অর্থনীতির ভাষায় স্বাধীন বাকের 'কুফল'কে এক্সটার্নালিটি বা অতিক্রিয়া ভাবলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াব আমরা? নদীর জলে আমার কারখানার দূষিত জল মিশলে অন্যদের উপর তার যে কুপ্রভাব পড়ে, সেটাই অতিক্রিয়া। ধরা যাক, আমার স্বাধীন কথায় আপনার মনে আঘাত লাগলে সেটাও আমার কথার অতিক্রিয়াই। অর্থাৎ, কথাটা বলে আমার নিজের আনন্দ হচ্ছে বটে, কিন্তু সেই চক্করে আপনার খারাপ থাকা বাড়ছে। যে প্রক্রিয়ায় অতিক্রিয়া আছে, তাকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকারও রাষ্ট্রের আছে, অন্তত কোনও রাষ্ট্র তেমনটা মনে করলে আপত্তি করার উপায় নেই। অতএব রাষ্ট্র ঘোষণা করতেই পারে, আজ থেকে কোনও একটি কথা আর বলা চলবে না। যেমন ধরুন, কোনও রাষ্ট্র ঘোষণা করতেই পারে, আজ থেকে মহম্মদের ছবি আঁকা নিষিদ্ধ।

কিন্তু প্রায় সব কাজেরই যেমন অতিক্রিয়া থাকে, তেমন প্রায় সব কথাতেই কারও না কারও মনে আঘাত লাগতে পারে। রাষ্ট্র যদি সমদর্শী হয়, তবে প্রত্যেকটা খারাপ লাগাকেই সমান গুরুত্ব দেওয়া তার কর্তব্য। অর্থাৎ রাষ্ট্রের পক্ষে দুটি পৃথক দিকে হাঁটা সম্ভব। এক, যেখানে কারও কোনও কথা খারাপ লাগলেই (এমনকী, খারাপ লাগার আশঙ্কা থাকলেও) তা নিষিদ্ধ করে দেওয়া যেতে পারে। ফ্রান্সে যেমন ইহুদিবিদ্বেষী কথা নিষিদ্ধ। অতএব, বলা যেতে পারে, মুসলমানদের (অথবা খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু বা অন্য কোনও ধর্মাবলম্বী মানুষের) ধর্মবিশ্বাসে যে কথা আঘাত করতে পারে, সেগুলোকেও নিষিদ্ধ করা সমদর্শী রাষ্ট্রের কর্তব্য। অথবা, রাষ্ট্র বলতে পারে, যে কথা শুনতে খারাপ লাগছে, অথবা যে সিনেমা-ছবি-বই-নাটকে আঘাত

লাগছে কোনও বিশ্বাসে, দয়া করে সেগুলিকে এড়িয়ে চলুন। ভাল না লাগলে মকবুল ফিদা হুসেনের সরস্বতী দেখবেন না, পড়বেন না সলমন রুশদি বা তসলিমা নাসরিনের বই, অথবা পিকে-র বদলে বান্ধবীকে নিয়ে অন্য কোনও সিনেমা দেখতে যান। আপনি যে গান শোনেন তা আমার কুরুচিকর মনে হতে পারে, এবং সেই গান লোকে শোনে ভাবলে সমাজ কোথায় তলিয়ে যাচ্ছে গোছের চিন্তাও আমাকে যন্ত্রণা দিতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ না মাইকে সজোরে সেই গান চালিয়ে আপনি আমার জীবন অতিষ্ঠ করছেন, ততক্ষণ আপনার সেই গান শোনায় হস্তক্ষেপ করার পক্ষে যুক্তি দুর্বল, কারণ আপনার যা ঘোর অপছন্দের, তা হয়তো আর এক জনের কাছে বেঁচে থাকার মন্ত্র। এটা ঠিক যে এই নানা উদাহরণে, যাঁরা অপছন্দ করছেন তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই এই ঘটনাগুলোর নেতিবাচক অতিক্রিয়া মারাত্মক। কিন্তু, যতক্ষণ সেই অতিক্রিয়াকে এড়িয়ে যাওয়া যায়, রাষ্ট্রের হাত গুটিয়ে থাকাই সমীচীন। অবশ্য, কারও পক্ষে কোনও অতিক্রিয়া যখন এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব হবে, তখন রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে বিলক্ষণ। কিন্তু সেটা বাকস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ নয়, মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষার প্রক্রিয়া।

শুধু তা-ই নয়, অতিক্রিয়া থাকলেই যদি রাষ্ট্র বাকস্বাধীনতা খর্ব করতে থাকে, তা হলে কি এমন একটা সমাজে পৌঁছনো যাবে যেখানে সব্বাই একে অপরকে ‘কিন্তু সবার চাইতে ভাল পাউরুটি আর ঝোলাগুড়’-এর বাইরে কোনও কথা বলবে না? মুশকিল হল, বাকস্বাধীনতা কেড়ে নিতে দিলে এমন আলুনি সমাজে পৌঁছনোও অসম্ভব। কারণ , রাষ্ট্র তো কোনও বায়বীয়, বিমূর্ত অস্তিত্ব নয়। সেই ক্ষমতার চূড়ায় যাঁরা বসে থাকেন , তাঁদের দিব্য রং থাকে, নিজস্ব ‘ভাবাবেগ’ থাকে, এবং তাতে আঘাতও লাগে বড় সহজেই। সেই রাষ্ট্র ‘সমদর্শী’ হবে, অর্থাৎ সবার ভাবাবেগকে সমান মর্যাদা দেবে, এমনটা ভেবে নেওয়ার কোনও কারণ নেই। অতএব রাষ্ট্রের হাতে বাকস্বাধীনতা খর্ব করার অধিকার এক বার তুলে দিলে শেষ পর্যন্ত তাদের অধিকারটুকুই খর্ব হবে, যারা রাষ্ট্রের চালকদের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলার সাহস দেখায়। আজ কেউ ‘রামজাদে’র উল্টো দিকে ছন্দ মিলিয়ে বিশেষণ খুঁজলে হরেক ভঙ্গিতে তার প্রতিবাদ করা সম্ভব। সেই অধিকার না থাকলে কী হবে, অনুমান করতে খুব বেশি কল্পনাশক্তির বোধহয় প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ, এই পিছল রাস্তা দিয়ে হাঁটলে আমরা যেখানে পৌঁছব তাতে শুধু আপত্তিকর কার্টুন নয়, কোনও কিছুই বলা বা লেখার স্বাধীনতা থাকবে না। আজ যাঁরা ক্ষমতাহীনদের পাশে দাঁড়িয়ে ক্ষমতাবানদের বাকস্বাধীনতায় লাগাম দেওয়ার সওয়াল করছেন, তাঁদের এই কথাটা ভেবে দেখা খুব জরুরি।

এখানে একটা কথা মনে রাখা ভাল। বাকস্বাধীনতা জিনিসটা কিন্তু নিখরচায় মেলে না। বহু ক্ষেত্রেই তার মূল্য চোকাতে হয়। বন্ধুবিচ্ছেদ থেকে মানহানির মামলা, সবই হতে পারে। অফিসে বসের বিরুদ্ধে বাকস্বাধীনতার অধিকার প্রয়োগ করলে চাকরি যাওয়াও বিচিত্র নয়। কিন্তু সেই বিরুদ্ধতাগুলোও অপর দিকের স্বাধীনতারই প্রকাশ। যতক্ষণ তা আইনের স্বীকৃত গণ্ডিতে থাকছে, অর্থাৎ কোনও কথায় ক্ষুণ্ন হয়ে কেউ বন্দুক হাতে তেড়ে না আসছে, ততক্ষণ এতে আপত্তির কোনও কারণ নেই। কিন্তু রাষ্ট্র যদি বাকস্বাধীনতায় লাগাম পরাতে আসে, সেটা বিপজ্জনক, কারণ রাষ্ট্রই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যার হাতে দমনপীড়নের আইনি অধিকার আছে। আর রাষ্ট্রযন্ত্রে যেহেতু ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীর প্রভাব বেশি, তাই সেই ক্ষমতার উপর লাগাম পরানোই গণতান্ত্রিক সমাজের উদ্দেশ্য, তার প্রসার নয়।

এ কথা ঠিক যে ক্ষমতার বৈষম্য আছে বলে বাকস্বাধীনতার আইনি অধিকারের অর্থ এই নয় যে, বাস্তবে সবার কাছে এই অধিকার সমান ভাবে আছে। গণতন্ত্রের ক্ষেত্রেও ঠিক এই কথাটা সত্যি। এমন নয় যে আপনার, আমার, এক জন দরিদ্র কৃষকের এবং এক জন বৃহত্ শিল্পপতির সবার একটাই ভোট আছে বলে আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে। কিন্তু এই কাঠামোটা না থাকলে ক্ষমতার বৈষম্য বাড়ত বই কমত না। যতই ফুটোফাটা আর রংচটা হোক, তবু গণতন্ত্রটুকু আছে বলেই খুব অতিষ্ঠ হয়ে পড়লে ভোটাররা শাসক দলকে শিক্ষা দিতে পারেন, এবং দিয়েই থাকেন, যার সর্বশেষ নমুনা আমরা দেখতে পেলাম দিল্লিতে।

আসলে অসুখের লক্ষণ এবং কারণের মধ্যে গুলিয়ে ফেলা ঠিক নয়। ক্ষমতার বৈষম্য সব সমাজে আছে, এবং তাকে খর্ব করা বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। সেই লড়াইয়ে বাকস্বাধীনতা একটা অবশ্যপ্রয়োজনীয় হাতিয়ার, কিন্তু কোনও মতেই তা একাই যথেষ্ট নয়। আর বাস্তবে বাকস্বাধীনতার অধিকার যে সবার সমান ভাবে আয়ত্ত নয়, সেটা সমস্যার উপসর্গ, তার কারণ নয়। তার প্রতিকার আর যা-ই হোক, বাকস্বাধীনতার সংকোচ নয়। কারণ সেই সংকোচের সুযোগ ক্ষমতাশীল গোষ্ঠীরা অনেক বেশি নেবেন। বহুকাল আগে বাম রাজনৈতিক মহলে একটা কথা শোনা যেত, ‘ভুখা মানুষ, ধরো বই, ওটা হাতিয়ার’। ‘কিন্তুবাদী’দের অনুরোধ, বাকস্বাধীনতার অধিকার খর্ব হলে আখেরে ভুখা মানুষের হাতে হাতিয়ার কমবে না বাড়বে, ভেবে দেখুন।